

# সাইমন জাকারিয়া

## বাউলতত্ত্বের সহজপাঠ

বাংলার বাউল গান ও বাউল সাধনার ধারা উপধারা নিয়ে বাংলাদেশে তো বটেই ভিন্ন ভাষী ও বিভিন্ন দেশের মানুষের সীমাহীন আগ্রহের বীজ সাম্প্রতিককালে অতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু এরপরও বাউল তত্ত্বের মূলকথা সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই স্পষ্ট কোনো ধারণা তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই প্রয়োজন বোধ করছি— বাংলার বাউল সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য প্রদানে। আমাদের বিশ্বাস, এখানে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুব সহজে বাংলার বাউল সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

আসলে, বাংলার বাউল, বাউল মত ও বাউল সংগীত সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, বাউল সাধনা, দর্শন তথা বাউল গান নিয়ে নানা জনের নানা মত প্রচলিত। এই মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'বাউল' শব্দটি। আসলে, 'বাউল' শব্দটির অর্থ, তাৎপর্য, উৎপত্তি ইত্যাদি নিয়ে অদ্যাবধি গবেষকেরা যেমন কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি, তেমনি 'বাউল মত' -এর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কোনো



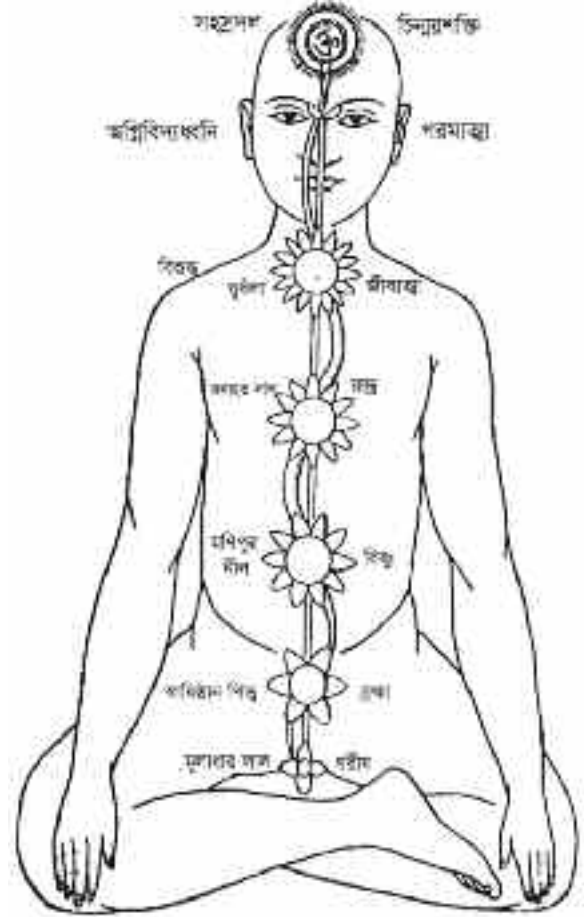
প্রবন্ধ

সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করতে পারেননি। নানা জনের নানা মত নিয়েই 'বাউল মত' বিষয়ে অমীমাংসিত আলোচনা চলছে এবং চলমান থাকবে বলেই আমাদের ধারণা।

বাউল মত ও তার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক তার 'বঙ্গ সুফি প্রভাব' গ্রন্থে নানা গবেষকের নানান মত বিশ্লেষণ করে বলেছেন— সংস্কৃত 'বায়ু' থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, তাদের মতে সংস্কৃত বায়ু= বাঙ্গালা 'বাই', 'বাই' শব্দের সাথে স্বার্থে 'ল' প্রত্যয়যোগে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, এই মতানুসারি গবেষকদের ভাষ্যে জানা যায়— বাংলার যে সব লোক 'বায়ু' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্যে সাধনার মাধ্যমে আত্মিক শক্তি লাল করার চেষ্টা করেন, তারাই বাউল।

মুহম্মদ এনামুল হক গবেষকদের ভাষ্য মেনে বাউল শব্দের উৎপত্তিগত উৎসের বিবেচনা করে আরো বলেছেন— সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, প্রাকৃত ব্যাকরণ মতে— দুই স্বরবর্ণের (এখানে 'আ' এবং 'উ') মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ (এখানে 'ত') লোপ পায়, আসলে এই সূত্রমতেই 'বাতুল' শব্দটি 'বাউল' হয়ে গেছে, গবেষকদের মতে— যে সব লোক প্রকৃতই পাগল, তাই তারা কোনো সামাজিক বা ধর্মের কোনো বিধিনিষেধ মানে না, তারাই বাউল।

বাউল মতের স্বরূপ নির্ধারণের প্রক্ষে আরেক দল গবেষকের কথা বলে মুহম্মদ এনামুল হক জানিয়েছেন যে,— প্রাকৃত 'বাইর' শব্দ হতে 'বাউল'



বাউল সাধনা ব্যবহৃত ষট্চক্র রেখাচিত্র

শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, 'বাইর' অর্থ এলো-মেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল। এই দলের গবেষক-মতে, বাংলার বাউলদের মতো একদল বিশৃঙ্খল চিন্তাজীবী লোক উত্তর-ভারতে প্রত্যক্ষ করা যায়, বাংলার বাউল চিন্তার দিক হতে তাদেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত শব্দ 'বাইর' বাংলাদেশে 'বাউল' শব্দে পরিণত হয়ে থাকবে, কেননা লোকায়ত সমাজে উচ্চারণ-ধ্বনির দিক দিয়ে 'র' এবং 'ল' বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এই দুটি বর্ণ পরস্পরের রূপ গ্রহণ করে থাকে।

আরেক শ্রেণির গবেষকদের ভাষ্যমতে এনামুল হক বলেন— 'বাউল' শব্দকে 'আউল' শব্দের পৌনঃপুনিক অপভ্রংশ বলে মনে করেন, তবে তারা এ কথা মনে করেন না যে 'আউল' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'আকুল' শব্দ হতে, তার বদলে মুসলমান সাধক অর্থে আরবি 'অলী' শব্দের বহুবচন 'আউলিয়া' শব্দ হতে 'ইয়া' প্রত্যয়ের পতনে উৎপত্তি বলে মনে করে থাকেন। তাদের মতে— বাংলার যে সব লোক মুসলমান দরবেশদের মতো লম্বা আলখেল্লা পরে, তাদের বাণী ও বিশ্বাসে আত্মপারায়ণ হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তারাই বাউল। এই জন্যই নাকি বাউল-সন্ন্যাসীদের 'ফকির' বলা হয়।

গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি ও তার অর্থ সম্পর্কে উপর্যুক্ত নিষ্পত্তিগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, 'বাউল' সম্প্রদায়ের নাম বাউলেরা নিজে গ্রহণ করে নাই। সাধারণ বাউল-নৈবিশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই, দেশের লোক তাহাদিগকে এই নাম দিয়াছে।

এই বক্তব্যের সাথে একথা যুক্ত করা অসঙ্গত হবে না যে, বাউলেরা নিজেরা যেহেতু নিজদের বাউল নামটি দেননি সেহেতু 'বাউল' শব্দটির



প্রবন্ধ

উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা নিয়ে নানা ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বাউল মতের মর্মকথা অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ পর্যায়ে বাউল-সাধকের রচিত সংগীতের বাণীকে আশ্রয় করেই বাউল মতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, একটি বাউল সংগীতের বাণীতে পাওয়া যাচ্ছে—

যে খুঁজে মানুষে খুঁদা  
সেই তো বাউল  
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে  
পাই তার উল্লা

পূর্ব জন্ম না মানে  
ধরা দেয় না অনুমানে  
মানুষ ভজে বর্তমানে  
হয় রে কবুল্লা

বেদ তুলসী মালা টেপা  
এসব তারা বলে ধুকা  
শয়তানে দিয়ে ধাপ্লা  
করে ভুল্লা

মানুষে সকল মেলে  
দেখে শুনে বাউল বলে  
দীন দৃদ্ধ কি বলে  
লালন সাঁইজির কুল্লা

চুয়াডাঙ্গার সাধক-শিল্পী আব্দুল লতিফ শাহের কণ্ঠে শোনা এই গানটির রচয়িতা হলেন বাংলাদেশের বিনাইদহ অঞ্চলের বাউল-সাধক দৃদ্ধ শাহ। উপর্যুক্ত সংগীতের বাণীতে ‘বাউল মত’ তথা বাউলতত্ত্বের মূল-কথাটা অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, বাংলার বাউলদের মূল পরিচয়ের প্রধানতম একটি দিক হলো— তারা মানুষেই শ্রষ্টার সন্ধান করেন। দ্বিতীয়ত দিক হলো— তারা প্রচলিত ধর্মগোষ্ঠীর লোকদের মতো অনুমানে বিশ্বাস করেন না, এমনকি পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরবাদকে মানতে নারাজ; তৃতীয়ত— বেদ তুলসী মালা টেপাকে তারা ধোকার কাজ বলে গণ্য করেন। আসলে, প্রচলিত ধর্মীয় চেতনার বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলার বাউল মত মূলত ‘মানুষে সকল মেলে’ এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। বাউল-গবেষক শক্তিনাথ ঝা তার ব্যাখ্যায় বলেছেন— ‘বাউল মতবাদ কোন ধর্ম নয়। সম্প্রদায় কথাটি শিথিলভাবে এখানে ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠী ও সামাজিক স্তরের ব্যক্তি বিশেষ গুরুর কাছ থেকে এ মতবাদ, গান ও সাধনা গ্রহণ করে নিজ নিজ সামর্থ্য ও সংস্কারানুযায়ী তা পালন করতে চেষ্টা করে এবং এক শিথিল স্বেচ্ছামূলক মণ্ডলী গঠন করে। সাধক আবার গুরু হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে পৃথক এক বৃত্ত নির্মাণ করে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুই-ই আছে। বাউল তত্ত্বে এবং সাধনায় প্রচলিত মূল্যবোধ ও আচারকে বিপরীত রূপে আদর্শায়িত করা হয়, প্রচলিত শাস্ত্রবিরোধী সাধনা নানা বৈচিত্র্য-মণ্ডিত রূপে বাউল জীবনচর্যা রচনা করেছে। অলৌকিক ঈশ্বর, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকে অবিশ্বাসী বাউল ইহবাদী, দেহবাদী। আর্থ—সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিবিধানের প্রতিবাদী মানুষেরা বাউল মতবাদ গ্রহণ করে।’ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বাউল মতের প্রভাব রয়েছে। তবে, এক এক অঞ্চলের বাউল মত এক এক রকমভাবে বিকাশ লাভ করেছে। যেমন— কুষ্টিয়া অঞ্চলের লালনপন্থী বাউল-সাধকদের সাধনা-পদ্ধতি, জীবনাচার-বেশ-বাস, সাধুসঙ্গ, এমনকি গায়কী ও গানের সুর-বাণী ইত্যাদির সাথে বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ইত্যাদি অঞ্চলের বাউলদের তেমন কোনো সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে ও সাধনার ঘর হিসেবে দেহকে আশ্রয় করার বিষয়ে কিছুটা মিল রয়েছে। আসলে, সব অঞ্চলের বাউলেরাই সাধনার আশ্রয় হিসেবে দেহকে অবলম্বন করে থাকেন এবং দেহ-ঘরের মধ্যে তারা সৃষ্টি-শ্রষ্টার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, আর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রায় সব অঞ্চলের বাউলেরা সাধনার ধারা অব্যাহত রাখেন। এক্ষেত্রে গুরুকে তারা শ্রষ্টার সমতুল্য বিবেচনা করেন।

তারা মনে করেন— গুরু বা মুর্শিদকে ভজনা করার ভেতর দিয়ে শ্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। গুরু-শিষ্যের এই পরম্পরাভেদকে লালন সাঁইজি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

যেহি মুর্শিদ সেই তো রাছুল  
ইহাতে নেই কোন ভুল  
খোদাও সে হয়;  
লালন কয় না এমন কথা  
কোরানে কয়লা

বাংলাদেশের বাউলেরা এভাবেই অকাটা যুক্তির আলোকে শরিয়তি গ্রন্থকে সামনে রেখেই গুরুবাদী ধারার সাধনচর্চাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ-গুরু ভজনা এবং মানুষকে সেজদার যোগ্য বিবেচনা করে, তার ভেতর দিয়েই যে শ্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ইবাদত সম্ভব বাংলার বাউল-সাধকেরা সেকথা ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেননি।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলার বাউল মত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। তাই বাউলেরা বৈষ্ণব, চিশতিয়া প্রভৃতি সাধক-শ্রেণির মতো কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায় নয়। বৈষ্ণব ও বিভিন্ন শ্রেণির সুফি মতের অনুসারীরা যেমন তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলতে পারেন, বাউলেরা তা পারেন না। অতএব, আদি বাউল কে— তা নিয়ে বিতর্কের কোনো শেষ নেই।

বাউল-গবেষক শক্তিনাথ ঝা অবশ্য বিভিন্ন গবেষকের সূত্র মিলিয়ে বাংলার বাউল মতের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন চর্যার পদ, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি সাহিত্য নিদর্শনের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা সহকারে। ৯ তার মতে, বাউলদের আদিগুরুর নাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও এ কথা অন্তত বলা যায়— বাংলার ‘বাউল পন্থা কোন অর্বাচীন মতবাদ নয়।’

বাউলদের স্বরূপ ও পরিচয় দিতে গিয়ে মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন— ‘বাউল’-দিগকে ‘বাতুল’ অর্থাৎ পাগল বলা হয়। বাউলেরা যাহার সন্ধানে পাগল, তাহার কোন নাম নাই,— তিনি ‘অনামক’। তবে তাহারা তাহাকে যখন যাহা খুশি সেই নামে অভিহিত করে। তাই দেখিতে পাই, তাহারা তাহাকে ‘মন-মনুরা’, ‘আলেক’, ‘আলেখ সাঁই’, ‘অচিন পাখী’, ‘মনের মানুষ’, ‘দরদী সাঁই’ ও ‘সাঁই’ প্রভৃতি কত নামেই না পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ যে নামেই তাহারা তাহাকে পরিচয় দিক না কেন, তিনি তাহাদের নিকট চিরদিনই ‘অনামক’। হিন্দুর ‘ব্রহ্ম’, বৈষ্ণবের ‘কৃষ্ণ’, বা মুসলমানের ‘আল্লাহ’-এর ন্যায় কোন একটি বিশিষ্ট নাম আরোপ করা তাহাদের স্বভাব নয়।’ একই সঙ্গে সেই পরমসত্যকে বাংলার বাউলেরা সাধারণ ধর্মচারী মানুষের মতো তারা ভীতিকর এবং দেহ ও নিজের আত্মগত সত্তার বাইরের বস্তু বলেও মনে করে না। বরং দেহকেন্দ্রিক ঘটচক্র যোগে সাধনায় আত্ম তথা শ্রষ্টা দর্শনের অপূর্ব প্রশান্তি খুঁজে ফেরেন।

বাংলার প্রখ্যাত ফোকলোর-সাধক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন তার হারামণি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘বাউল সাধনা ও ঘটচক্র’ শীর্ষক আলোচনায় দেহকেন্দ্রিক সাধনায় ঘটচক্রের অবস্থান এবং এই সাধনার প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনসুরউদ্দীনের ভাষ্য হলো— ‘ঘটচক্রের প্রধান কথা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, শরীর-মধ্যস্থ শক্তিরূপিনী কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে অপরিসীম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। তন্ত্রমতে শরীরে মঞ্জীল আছে, ছয়টি মঞ্জীলের ছয়টি নাম আছে, যথা, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। প্রত্যেকটি কেন্দ্র একটি পদ্মের ন্যায়, তার দল আছে এবং প্রত্যেক দলে সাক্ষেতিক অক্ষর এবং অদৃশ্য মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের অবস্থান বিভিন্ন স্থলে; মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে দুটি নাড়ীকে অবলম্বন করে কেন্দ্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। ইড়া আর পিঙ্গলা নাম্নী দুটি নাড়ী পরস্পরের সহিত জড়িত হয়েছে সুযুগ্ম-নাড়ীকে কেন্দ্র করে, মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ হতে উখিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং সম্মিলিত হয়েছে। মেরুদণ্ড তান্ত্রিক সাধনার বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ছয়টি কেন্দ্র এই মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত।’ সদগুরুর সাহায্য নিলেই একজন সাধক ঘটচক্রের এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। বাংলার বাউল সাধকগণ সংগীত চর্চার পাশাপাশি এই সাধনাত্তেও সিদ্ধি লাভকারী। ১৩